প্রান্তজনের ক

বিনায়ক সেন

প্রথম আলো
বুধবার ১৪ এপ্রিল ২০০৪

এই লেখাটি প্রান্তজনকে নিয়ে। তার না খেতে পারা নিয়ে, তার প্রতি অবিচার নিয়ে, তার সত্তার অবমাননা নিয়ে, তার অপমানবোধ নিয়ে, যেভাবেই দেখি না কেন, তার প্রান্তিকতা নিয়ে। তার প্রান্তিকতা নিয়ে কোথাও কোনো সংবেদন নেই, সন্তাপ নেই, সংলাপও নেই—সেই ক্ষোভ নিয়ে। প্রান্তজন কোনো এক মানসিক ছিটমহলের অধিবাসী, সে আমাদের দেশের মানুষ হয়েও অন্য ভুবনের বাসিন্দা, আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও ভিন্ন ভূখণ্ডে তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এবং ভুলে যাওয়া হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র, আমাদের কোনো থানা-পর্যায়ী আয়-ব্যয় জরিপ, আমাদের পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ তাকে আলাদা করে মনে রাখেনি। আমাদের কোনো কৌশলপত্র তাকে মনে রেখে রচিত হয়নি। কখনো সে হয় জন, যখন সে জন খাটে। কখনো সে জনগণের অংশ, যেমনটা ভোটের আগে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই সে অন্তরালবর্তী। মনুস্মৃতিতে এদেরই পূর্বপুরুষদের নিয়ে বলা হয়েছিল, এরা থাকবে 'নির্দিষ্ট কতিপয় বৃক্ষের তলে, শ্মশান-ক্ষেত্রে, পাহাড়ে, অরণ্যে, চিহ্নিত স্থানে'; তাদের 'বাসস্থান হবে গ্রামের বাইরে, মৃতের ভূষণ হবে তাদের পরিধেয়, ভাঙা মৃৎপাত্রে তারা আহার গ্রহণ করবে' এবং 'তাদেরকে হতে হবে ভবঘুরে, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তারা ঘুরে বেড়াবে'। আধুনিক প্রান্তজনেরা আমাদের প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সব সময়ই আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে।

কেন প্রথমেই না খেতে পারার প্রসঙ্গ তুললাম প্রান্তজনের কথা বলতে গিয়ে? মানুষ যে শুধু আহার গ্রহণের মাধ্যমেই বাঁচে না, এ তো অনস্বীকার্য। মানুষিক প্রকৃতি আহার্যের বাইরেও আরো অনেক কিছু দাবি করে। কিন্তু যে মানুষ একান্তই স্বাধীন সত্তা তাকে যখন না খেতে পাওয়ার দিনের পর দিন কষ্টে ভুগতে হয়, সেই অবমাননা অসহনীয়। কমলকুমার মজুমদারের 'তেইশ' গল্পের নায়ক আলম পরিবারের খিদের কষ্ট দূর করার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজেকে অন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার আগে সে বহুদিন ভেবেছে এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে। বউকে সে খাওয়াবে কী, গাঁয়ে কাজ নেই। গতর আছে বলে কেউ ভিক্ষে দেয় না, তার ওপর বয়স যথেষ্ট এখন, রোগে রোগে সে কমজোরি, হায়রে দু চোখ যদি তার অন্ধ হতো! এবং এ জন্য সে গাঁয়ের রাখ্ ডুমনীর টোটকা ওষুধের সাহায্য নেয়। গল্পের সমাপ্তি দৃশ্যে সে বলে ওঠে : 'দেখ বউ—এবার ভিক্ষে মিলবে রে আমি রাখ ডুমনীর ওষুধ খেয়েছি—জমি গেছে তাতে কি—খাবার আর ভাবনা নেই—ভিক্ষে পাব রে আমার ওপর সবার দয়া হবে রে'—কমলকুমার জানাতে [illegible] না এরপর যে, এ কথা শুনে 'বউ খুশি হয়েছিল।'

এই স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব-বরণ নিয়ে কিছু বিতর্ক উঠতেই পারে। কিছু জমি এক সময় আলমেরও ছিল, এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে, বড় কোনো সংকটে পড়ে, দায়দেনায় সে জমিও নিলামে উঠেছিল, আজ আবার সেই জমি ছ-আনির বাবুরা যখন আবার তাকেই ভাগচাষে নিতে বলেছিল, রাগে-ক্ষোভে সেই প্রস্তাব সে ফিরিয়ে দিয়েছিল। নিজের চৌদ্দপুরুষের জমিতে সে ভাগচাষি—এটা তার মনে খুব লেগেছিল। সেই মানুষই হেরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে ছ-আনির বাবুদের কাছেই ভিক্ষের জন্য আবার দাঁড়ায় কী করে? এ প্রশ্নের উত্তরে আলম হয়তো বলতে পারত, অন্ধ হলে তো আর আলাদা করে কোনো ব্যক্তি পরিচয় থাকে না, তখন সকলের কাছেই হাত পাতা যায়—সে বলতে পারত, 'আমি তো এখন আর আলম নই বউ, এখন ছ-আনির বাবুদের কাছে ভিক্ষে চাইতে আর বাধবে না, বাবুরা হয় সজ্জন।' আমরা নিম্নবর্গের প্রতিরোধ/পরাভব বিতর্কে আর যাব না এখন, শুধু বলব এই একবিংশ শতাব্দীর না-খাওয়া মানুষদের কষ্ট আলাদা করে মনে রাখার কারণ রয়েছে।

২.

না-খাওয়া মানুষদের নিয়ে এত সাতকাহন কেন, এতে করে বেশ অতিরঞ্জনই হচ্ছে, এই মর্মে দুটো যুক্তি সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমত, দুর্ভিক্ষের ছায়া থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে এসেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত মানুষের অংশ আগের তুলনায় প্রতি বছরই কমছে। এখন দেশের প্রধান সমস্যা হলো দ্রুত হারে প্রবৃদ্ধি [illegible], দারিদ্র্য কমানো, সামাজিক সূচকের সহস্রাব্দ লক্ষ্যগুলো অর্জন ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, চরম দরিদ্র বা হতদরিদ্রদের জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এনজিও পর্যায়ে বেশ কিছু ঋণ-দান, প্রশিক্ষণ ও সম্পদ স্থানান্তর কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে না-খাওয়া মানুষদের সমস্যারও সমাধান মিলবে।

এ সবই সত্য পর্যবেক্ষণ। কিন্তু সংশয়গুলো এখানে কিছুটা হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম বক্তব্য হলো, এখনো না-খাওয়া মানুষের সংখ্যা একেবারে কম নয়। আগেই বলেছি যে, পরিসংখ্যানগত মনোযোগের মধ্যে অভুক্ত মানুষেরা আলাদা করে নেই। তার পরও পরোক্ষ কিছু প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পরিমাণগত কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ২০০০ সালের একটি গ্রামীণ জরিপে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি আপনার খাবার আর সবাইকে নিয়ে তিন বেলা পেট পুরে খেতে পারেন কি না?' জরিপটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়েছিল দেশের নানা এলাকায়, অর্থাৎ গ্রামবাংলার প্রতিনিধিত্বশীল জরিপ ছিল সেটা। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছিলেন যে তারা তিন বেলা পেট পুরে খেতে পারেন না। আরো কিছু প্রশ্ন থাকলে আরো ভালোভাবে অনাহারের তীব্রতা বোঝা যেত। আমাদের জানার আগ্রহ ছিল, এদের মধ্যে কত শতাংশ কেবল দু বেলাই খেয়ে থাকেন, বা কত শতাংশ বছরের কত মাস বা কত দিন এক বেলা খেয়ে থাকেন, বা কত শতাংশ পরিবারে শিশুরা হয়তো তিন বেলা খান কিন্তু প্রাপ্তবয়স্করা দু বেলাই খেয়ে থাকেন। আমরা হয়তো এক পর্যায়ে সংকোচ-টংকোচ বাদ দিয়ে জিজ্ঞেসই করতাম, খান তো—কিন্তু কী খান আসলে? বাসায় সর্বশেষ কত মাস কত দিন আগে মাংস খাওয়া হয়েছিল? গেলবারের ঈদে কি ছেলেমেয়েরা 'ভালো খাবার' পেয়েছিল? এসব প্রশ্ন করা সহজসাধ্য নয়। তবু এসব ওই জরিপে থাকলে অনাহারের চিত্র আরেকটু স্পষ্ট হতো।

দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, এনজিওদের মধ্যে যারা চরম দারিদ্র্য নিয়ে বিভিন্নভাবে কাজ করছেন তাতে দরিদ্রদের মধ্যে 'অপেক্ষাকৃত বেশি দরিদ্র', এমন জনগোষ্ঠীর একটি অংশ বেশ কিছুটা সুফল পেতে যাচ্ছে বলে মনে হয়। যদিও এসব কর্মসূচির যা বয়স তাতে করে প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য আরো কিছুকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সাধারণভাবে ধারণা হয় যে, চরম-দরিদ্র বা হতদরিদ্র কারা, তা নিয়ে বেশ কিছুটা ভিন্নতা আছে সংস্থাগুলোর মধ্যে। কর্মসূচির ধারাতেও পার্থক্য আছে : কোথাও দেওয়া হচ্ছে সুদমুক্ত ঋণ, কোথাও সুদযুক্ত ঋণ এবং তাও আবার ওঠানামা করছে ৫ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে। কোথাও আবার ঋণ নয়—জোর দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণের ওপর। তাই মনে হতে পারে, 'আলট্রা-পুওর'মুখীন হলেও সবাই একই ধারার, গোত্রের বা সামাজিক স্তরের আলট্রা-পুওর নয়। ফলে এমনও হতে পারে, দরিদ্রতর স্তর থেকে শেষ পর্যন্ত যারা এসব কর্মসূচিতে স্থান পাচ্ছেন তারাও হয়তো 'সবার অধম দীনের হতে দীন' নন। ইতিপূর্বে যে জরিপের কথা উল্লেখ করেছি তার থেকে অন্তত এটুকু স্পষ্ট হয়েছিল যে, চরম দরিদ্র মানেই না খেয়ে থাকা মানুষ নয়। অনাহারী মানুষদের ৫৫ শতাংশ ছিলেন আয়/সম্পদের বিচারে চরম দরিদ্র, ৩১ শতাংশ ছিলেন দরিদ্র, বাদবাকিরা ছিলেন নিম্ন/পড়তি-মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে। সুতরাং শুধু আয়/সম্পদের বিচারে দরিদ্র বা চরম-দরিদ্রদের টার্গেট করলেই না-খাওয়া মানুষদের কাছে পৌঁছানো যাবে, বিষয়টা তেমন নয়। এ থেকেও না-খাওয়া পরিস্থিতিকে আলাদা করে নীতিমালার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার দরকারিতা বোঝা যায়।

সরকারি বেশ কিছু 'দারিদ্র্য দূরীকরণ' কর্মসূচির কথা এখানে ইচ্ছে করেই বাদ রাখছি। ভাতা জাতীয় কর্মসূচি (যেমন, বয়স্কভাতা বা বিধবা ভাতা) সরাসরিভাবে চরম দরিদ্রদের কথা মনে রেখে তৈরি করা হয়নি। প্রাথমিক বৃত্তি কর্মসূচিতেও চরম দরিদ্ররা খুবই সীমিত মাত্রায় এসেছেন। ভিজিডি কর্মসূচি ক্ষুদ্র ঋণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'আইজি-ভিজিডি' হওয়ার পর থেকে চরম দরিদ্রের মধ্য থেকে সবচেয়ে অবহেলিত যারা 'প্রশিক্ষণযোগ্য নয়' এই যুক্তিতে তারা আরো বেশি সংখ্যায় বাদ পড়েছেন। কাবিখা (যা এখন নগদ অর্থ প্রদানের মধ্য দিয়েও অনেক এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে) কর্মসূচিতে চরম দরিদ্রদের অংশগ্রহণ বেশি, কিন্তু এর প্রভাব সীমিত মৌসুমি কার্যক্রমের কারণে। যারা সারা বছরই খাদ্য ঘাটতি সমস্যায় ভোগেন তাদের একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায় ২০০০ সালেরই অন্য একটি জরিপের (ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে) মধ্য দিয়ে। প্রায় এক-চতুর্থাংশ গ্রামীণ পরিবার নিজেদের আত্ম-সনাক্ত করেন 'সারা বছরই খোরাকির অভাবে আছি', এমন শ্রেণী হিসেবে। এদের খাদ্য-ঘাটতির মোকাবিলায় কাবিখা-জাতীয় মৌসুমি কর্মসূচি সামান্যই প্রভাব রাখবে।

হতে পারে যে, উন্নয়নের ডিসকোর্স হিসেবে দারিদ্র্য ধারণার পুনরাবিষ্কারের কারণে আলাদা করে অনাহারী মানুষদের ওপর থেকে আমাদের মনোযোগ সরে গেছে। হতে পারে যে, দুর্ভিক্ষ নিবারণী নীতিমালার সাফল্যের কারণে আমরা না খেয়ে থাকা অবস্থার প্রতি সামাজিকভাবে সেভাবে মনোযোগী হতে পারিনি। অনাহারী মানুষেরা কারা, তারা কোথায় থাকে, তারা কোন বয়সের, তারা কোন কাজে নিয়োজিত বা তারা কীভাবে বেঁচে আছে, বা সেভাবে তো তারা বেঁচে নেই—এসব জরুরি প্রশ্ন আমাদের কাছে মামুলি হয়ে গেছে। যে কারণেই এটা ঘটে থাকুক, আমার বলার কথা এই যে, প্রান্তজনের অংশ হিসেবে, প্রান্তজন হিসেবে, এই না খেয়ে থাকা অভুক্ত অনাহারী মানুষেরা আলাদা করে নীতিমালা প্রণেতাদের, রাজনীতিবিদদের, সুশীল সমাজের, উচ্চবর্গের, এমনকি নিম্নবর্গের মোটামুটি খেয়ে-পরে চলা মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না। তারাপদ রায়ের 'দারিদ্র্য-রেখা' কবিতায় যেমন, ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর ঝকঝকে লম্বা লাইন টেনে এদের বলা হচ্ছে যে, 'এই যে রেখা দেখছ, এর নিচে, অনেক নিচে তুমি রয়েছ।' তাতে করে প্রান্তজনের প্রান্তিকতাকে অতিক্রম করা দূরে থাক, খুব সামান্যই দৃষ্টিগোচর করা যাচ্ছে।

৩.

কিন্তু প্রান্তজনের সমস্যা কেবল না-খাওয়া মানুষের সমস্যা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। [illegible] বলেছিলাম,

দুর্ভিক্ষের ছায়া থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে এসেছে কিন্তু প্রান্তজনের সমস্যা কেবল না-খাওয়া মানুষের সমস্যা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না

র কথা

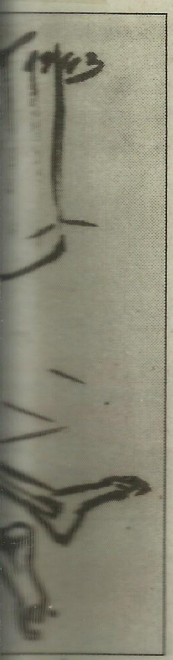

প্রান্তিকতার আরেকটি মাত্রা ধরা পড়ে চরম অবমাননায়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন রেলস্টেশনে কর্মরত পথশিশু/পথকিশোরদের সঙ্গে কথা বলে অবমাননার কয়েকটি দিক ধরা পড়ে। কমলাপুর স্টেশনের এক চৌদ্দ/পনের বছরের কিশোর (যাত্রীদের বোঝা টানা যার কাজ) বলছে : 'স্টেশনে সবচেয়ে বড় সমস্যা পুলিশ। যখন-তখন ধাওয়া করে। রাতে প্লাটফর্মে শান্তিমতো ঘুমাতে দেয় না। রাত ১২টার পরে ঘুমাতে হয়। আবার ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠতে হয়। এর আগে পরে হলেই পুলিশ লাঠি দিয়ে গুঁতায়। কখনো আবার তারা অন্যায়ভাবে ছেলেদের ধরে ভবঘুরে কেন্দ্রে পাঠায়।' এয়ারপোর্ট স্টেশনের আরেক বারো/তের বছরের ছেলে বলছে একই কথাই : 'পুলিশ যে কখন কী কারণে পুলাপান ধরে, তা বুঝি না। বড় কোনো অফিসার, মন্ত্রী আইলে আমাদেরকে প্লাটফর্মে ঢোকতেই দেয় না। প্রথমবার আমার সঙ্গে আরো ২০/২২ জনরে ধরে ময়মনসিংহের ধলার ভবঘুরে কেন্দ্রে পাঠাইছিল। ওই কেন্দ্রে আমাদেরকে ২০/২৫ দিন আটকায়ে রাখছিল। তিন বেলা খাওন দিত। কিন্তু খাবার দিত খুব খারাপ। ওসব কোনো মানুষে খাইতে পারে না। ওখানে যে কয়দিন ছিলাম, সে কয়দিন খাওয়াদাওয়ার খুব কষ্ট হইছে। ২০/২৫ দিন পরে আমাদের সবাকে ছাইড়ে দেয়। এরপর পুলিশে আবার ধরছিল। দুই দিন পরেই পালায়ে চইলে আসি।' প্রায় সব পথশিশুই বলেছে, 'টোকাই' আর 'কাঙালি' বলে তাদের যখন ডাকে তখন তাদের মনে প্রচণ্ড লাগে। একজন বলেছে : "যাত্রীরা মনে করে আমি 'কুলি'। আর কুলিরা বলে আমি 'কাঙ্গালি'। সমাজের ভদ্র মানুষেরা আমাদেরকে মানুষ মনে করে না। আমাদেরকে তারা পাত্তাই দেয় না। অনেকেই আবার চোর সন্দেহ করে। এসব কারণে নিজেকে খুব অসহায় আর ছোট মনে হয়। মানুষ যখন কাঙ্গালি বলে তখন আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কখনো কখনো মনে মনে ওদের গালি দিই। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারি না।"

পুলিশের হয়রানি, ভবঘুরে কেন্দ্রের দুর্ব্যবহার, টোকাই/কাঙালি ধারণায় মনোকষ্ট এসব বর্ণনায় ঘুরে-ফিরে এসেছে। প্রায় সবাই একইভাবে বলতে চেয়েছে, 'রাস্তায় থেকে কেউ ভালো মানুষ হতে পারে না। রাস্তায় থাকা ভালো না।' কিন্তু রাস্তায় থাকার চেয়েও খারাপ লেগেছে উচ্চবর্গের হয়রানিগুলো। তার পরও অবাক হওয়ার মতো ঘটনা বেশির ভাগই মনে করে 'সরকার চাইলে অনেক কিছু পারে'। রাষ্ট্র/সরকার এসব ধারণার প্রতি বিশ্বাস তাহলে এখনো ওঠে যায়নি। তবে অগাধ নয়, ন্যূনতম প্রত্যাশা তাদের। একজন যেমন বলেছে : 'সরকার পুলিশকে বলতে পারে—যেসব শিশু স্টেশনে থাকে, তাদেরকে নির্যাতন করা যাবে না। কিন্তু সরকার কিছু করছে না। আমার মতো যারা পঙ্গু, সরকার তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। আমাদের জন্য স্কুল, ক্লাব দিতে পারে। অথচ সরকার আমাদের জন্য কিছুই করছে না।' কেউ বলেছে, ৫-৬ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারলে গ্রামে গিয়ে ছোট একটা মুদি দোকান দিয়ে মার কাছে থাকবে, কারণ মা এখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ। তার সেবা করতে হবে। কেউ বলেছে, সঞ্চয় করতে পারলে শহরেই কিছু একটা করবে। কেউ বলেছে, বড় হলে ভ্যানগাড়ি চালক হবে বা বাসের হেলপার হবে। আবার কেউ বলেছে, বড় হলে এই স্টেশনেরই কুলি হবে। কেউ কেউ বলেছে, 'কোনো কিছুই হওয়ার কথা ভাবি না। কোনো টাকাপয়সা জমাই না। যতক্ষণ হাতে টাকা থাকে, ততক্ষণ আমি শুধু খাই। টাকা জমাইমু কার কাছে? টাকা থাকলে আমার খাওয়ার কোনো অভাব নাই। যখন টাকা না থাকে, তখন না খেয়ে থাকতে হয়।' এর একটা কারণ পথে পথে ঘোরার সব সময়ের নিরাপত্তাহীনতা। টাকা জমা রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। একজন বর্ণনা দিয়েছে কীভাবে বছর তিনেক আগে অনেকগুলো টাকা রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে তার পকেট থেকে চুরি করে নিয়ে যায় : 'সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন দেখছি আমার পকেটে টাকা নাই, তখন আমি পাগলের মতো হয়ে গেছিলাম। ওই দিন খালি কাঁদছি। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হই।' বেশির ভাগই বলেছে, সাহায্য চাই না, কাজ চাই। আর সকালে যদি পড়ালেখা করা যায়। কী ধরনের সমাজ আশা করো? এই প্রশ্নের উত্তরে একটা বড় অংশ বলেছে, সেই সমাজই ভালো, যেখানে গরিবের সঙ্গে ধনীরা ভালো ব্যবহার করবে, কাজের সুযোগ থাকবে আর ন্যূনতম একটা আয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এই হচ্ছে রাস্তা থেকে দেখা সামাজিক ন্যায়-বিচারের ধারণা, অন্তত তার

শুধু দারিদ্র্যের কারণেই যে প্রান্তিকতার জন্ম হয় তা কিন্তু না। অনেক পথশিশু, পথকিশোরদেরই জন্ম হয়েছে মোটামুটি আয় করা পরিবারে। কিন্তু বাবা বা মার মৃত্যুর পর পারিবারিক বন্ধনগুলো আলগা হতে শুরু করে। বাবার বা মার পুনর্বিবাহ, চাচা বা মামাদের শত্রুতা, বড় ভাইয়ের দুর্ব্যবহার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অসহযোগিতা আদি-পরিবারটিকে ঘিরে বড় ধরনের সংকটাবর্তের সৃষ্টি করে। হঠাৎ-দারিদ্র্যের পরিবেশে সামাজিক সহযোগিতার অভাব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পথশিশুদের এই অলক্ষ সামাজিক আত্মপ্রকাশের পেছনে প্রধান কারণ হয়ে কাজ করে থাকবে। শহরে আসার আগে তাদের ওপরে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর দুর্ব্যবহারের মর্মন্তুদ বর্ণনা দিয়েছে তারা। কেউ বলেছে, বড় হলে এই অবিচারের প্রতিশোধ নেবে। কেউ আবার এখন কিছুটা অবস্থা ভালো হওয়া সত্ত্বেও আর ফিরে যেতে চায়নি পুরনো পরিবেশে। যা পুরোনো তাকে ভুলে যেতে চেয়েছে।

৪.

সবচেয়ে বোধকরি কষ্টে আছে প্রত্যন্ত চর এলাকার, নদীভাঙনের শিকার, শুধু দিনমজুরির ওপর নির্ভরশীল প্রান্তিক মানুষেরা। মঙ্গার মাসগুলোয় এখানে অভাব তীব্র হয়, কিন্তু অনাহার এখানে চলে প্রায় সারা বছর। এই দুর্দশার জীবনবৃত্তান্ত একনাগাড়ে পড়ে ফেলা যায় না। পড়তে গেলে বারবার থামতে হয়। মনে হবে এক অসম্ভবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে, যেখানে ধারাভাষ্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের পতন অনিবার্য। এ বছর যাদের সাক্ষাৎকার নিলাম, আগামী বছর হয়তো আর দেখা পাওয়া যাবে না তাদের। কুড়িগ্রাম জেলার মোগলবাসা ইউনিয়নের ৬০/৬৫ বছরের বৃদ্ধা জানাচ্ছেন : 'হামার অভাব বাবা সারা বছর। ওই আল্লায় যখন মিলেয় তখন খাই। এক বেলা খাইলে আরেক বেলার চিন্তে করতে হয়। জমিজমা হামার কিছু নাই। বেটারা হাতের পর চলে। জমিজমা যা ছিল তা নদীয়ে ভাঙে নিছে। সাত বছর আগে স্বামী মারা গেছে। স্বামীও মইরে গেল, হামার কপালে দুঃখও লাগল। স্বামী মইরে যাওনের পর নদীও বসতভিটা সব ভাঙে হামার সর্বনাশ করল। বেটারা সব ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেল। এই যে কাছে আসলেন, বসলেন, সবকিছু শুনলেন। ওই রকম বেটারা কোনো সময়ও কাছে বইসে একটু জিগেয় না। এই যে আপনে কাছে বসে কথা কইলেন, এতেই হামার শান্তি। হামার বাবা যতক্ষণ হাত আছে ততক্ষণ হাতের পরই চলবের চাই। সারা বছরই মানুষের ওখানে হাছড়া হাছড়ি করি। ওই সকালে কাম করতে গেলে খানিক কাম করার পরে, মানুষের বাসি ভাত থাকে না, পানতা ভাত থাকে না তাই দিলে ভাহে খামু। আর সারা দিন কাম করিয়ে বিকেলে আধ সের চাল খোরাকি দেয়। আর কোনো টেহাপয়সা নাই দেয়। বুইড়ে মানুষের যেমন কাম, তেমন দাম।'

হ্যাঁ, বৃদ্ধা সত্যই উপলব্ধি করেছেন, মানুষের যেমন কাম, তেমন দাম। আমি এখানে আরো অনেকের প্রসঙ্গ টানতে পারতাম। তারপরও একজনের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। রংপুর জেলার পীরগাছা থানার এক বাঁশিবাদক বলেছিলেন, অভাবের সময় বাঁশি বাজানোর কাজ পাওয়া যায় না। আগে যাত্রায় বাজাতেন, এখন সেই যাত্রায় বেশি মানুষ যায় না। এখন তিনি শুধু বিয়ে-শাদিতে ডাক পেলে যান, সিগারেটের প্রচারে যান। কোনো মিছিল, অনুষ্ঠান হলে সেখানেও যান। কোনো অনুষ্ঠানে গেলে দেড়শ/দুইশ টাকা পান। জমিজমা নেই—এভাবেই সংসার চলে। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বলেছিলেন : 'গত তিন মাস যাবৎ খায়ে না খেয়ে খুব কষ্ট করে চলতেছি। সবারই অভাব। ওই জুটাইতে পারলে খাই, না পারলে না খাই।' ধার-কর্জ করে চলেছেন, কিন্তু সেটাও কত আর করা যায় : 'ওই দোকানেও দিনে দিনে প্রায় সাত/আটশ টাকা বাকি পড়ছে। এখন বাকি টাকা না দিলে ওই দোকান থেকে আর

বিবেক আছে না। ছোট একটা দোকান। ওই দোকান থেকে আর কত বাকি নেওয়া যায়। এই জন্য কয় দিন যাবৎ লজ্জায় ওই দোকানেই আর যাই না। তাই এই কয় দিন যাবৎ উপাসটা বেশি হয়ে গেছে। ১৪ টাকা কেজি চাল। চাল কিনার মতো কোনো টাকাপয়সা হাতে ছিল না। সে জন্য একজনের কাছ থেকে পাঁচ টাকা ধার করে বাজার থেকে 'একটু একটু নষ্ট' ধরনের আলু কিনেছিলাম। সেই আলু খেয়ে সবারই ডায়রিয়া শুরু হয়। সাত বছরের ছেলেটা ও তিন বছরের মেয়েটাও আক্রান্ত হয়। যেদিন এরা মারা যায়, সেদিন সকালে 'ডাক্তার আপায়' (ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার-এর স্বাস্থ্যকর্মী) আইছিল। সে কইছিল ওদেরকে হাসপাতালে নিতে, কিন্তু হাসপাতালে নিতে ভেনগাড়ি ভাড়া করতে হবে। আমার কাছে তো কোনো টাকা ছিল না। নিজেও অসুস্থ ছিলাম। আমার আসলে তখন কোনো হুঁশই ছিল না। কেমনে যে কী হয়ে গেল! পাইসে-কড়ির অভাবে ছেলেমেয়ে দুইটাকে পোড়াইতেও পারি নাই। এখন ওদের সৎকার কেমনে করি সেইটে নিয়েই চিন্তেয় আছি।'

আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আমার সহকর্মী রব্বানীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—শেষ পর্যন্ত ওদের সৎকার হয়েছিল কি না? কিন্তু রব্বানীর সেটা জানা সম্ভব ছিল না, সে তার পরপরই ঢাকা চলে আসে। এ মুহূর্তে বাঁশিবাদকের পরিবার কেমন আছে তা বলতে পারব না। মঙ্গার কাল রাজনৈতিকভাবে ভালয় ভালয় অতিক্রান্ত—এ নিয়ে আবার আগামী বছরের মৌসুম না আসা পর্যন্ত আমাদের উন্নয়ন-সংলাপ আপাতত স্তব্ধ হয়ে থাকবে।

সেটা হয়তো এ কারণেও যে না-খাওয়া মানুষেরা বা রেল স্টেশনের পথ-কিশোরেরা, নদী-ভাঙা গৃহহারা বৃদ্ধা, চরের বংশীবাদক, আর যাদের কথা স্থানাভাবে এখানে বলতে পারলাম না, সেইসব দিনমজুর, জেলে, কুমার, কামার, ঋষি, ভ্যানচালক, হরিজন, অক্ষম, বাজনদার, ভিক্ষুক নানা জেলায় ছড়িয়ে থাকা সেই সব প্রান্তজনেরা কখনোই আমাদের উন্নয়ন-সংলাপের মূলধারায় ছিলেন না। উন্নয়নের মূল স্রোতধারা যেখান দিয়ে বইছে, সেদিক থেকে দেখলে তাদেরকে মনে হতে পারে এক বাড়তি উপাদান, এক অনাবশ্যক বোঝা, এক ধরনের সামাজিক বর্জ্যের মতো। দার্শনিক জিগমুন্ট বাউমান তার *ওয়েস্টেড লাইভস : মডার্নিটি অ্যান্ড ইটস আউটকাস্টস* গ্রন্থে সম্প্রতি যা বলেছেন তা হয়তো এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, একটা সময় ছিল যখন আমরা তাদের বলতাম 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজার্ভ আর্মি', তাতে করে অন্তত এটুকু আশা থাকত যে, এখন এই বাণিজ্যচক্রে ডাক না পড়লেও আগামীতে নিশ্চয়ই কাজের ডাক পড়বে। এখন 'তাদের' আমরা বলছি 'রিডানডেন্ট'—প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অনাবশ্যক। এতে করে বাহুল্যতাকে, বেকারত্বকে, প্রান্তিকতাকে একটি স্বাভাবিক রূপ দেওয়া হয়েছে। যেন 'কর্মহীনতা' ধারণার মধ্যে কোথাও কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই, যেমনটা রয়েছে 'স্বাস্থ্যহীনতা' ধারণার মধ্যে। এখন সব প্রান্তিকতাই স্বাভাবিক, যেমনটা কালক্রমে আবর্জনা জমে কোনো একটা স্থানে, স্বাভাবিক নিয়মে, এরাও তেমনি : "Redundancy' shares its semantic space with 'rejects', 'wastrels', 'garbage', 'refuse'—with waste. The destination of the unemployed, of the 'reserve army of labour', was to be called back into active service. The destination of waste is the waste-yard, the rubbish heap." যেমনটা দেখা যায় জানালা দিয়ে তাকালে গলির মোড়েই আবর্জনার স্তূপে ডুবে থাকা কতিপয় শিশু ও কিশোরী, সময় সময় কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও বৃদ্ধা রমণী কিছু একটা খুঁজতে থাকে, সারাক্ষণ কিছু একটা খুঁজতেই থাকে। এবং এদের নিয়ে, এই মানবিক বিনাশ নিয়ে—শহীদ কাদরী প্রায় কুড়ি বছর আগেই যেমন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই!

২০০০ সালের একটি গ্রামীণ জরিপে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি আপনার খাবার আর সবাইকে নিয়ে তিন বেলা পেট পুরে খেতে পারেন কি না?' ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছিলেন যে তারা তিন বেলা পেট পুরে খেতে পারেন না। আমাদের জানার আগ্রহ ছিল, এদের মধ্যে কত শতাংশ কেবল দু বেলাই খেয়ে থাকেন, বা কত শতাংশ বছরের কত মাস বা কত দিন এক বেলা খেয়ে থাকেন